ঘেন্না-পিত্তি

সোমনাথ রায়

বাংলা চটি সিরিজ
একটি গুরুচন্ডা৯ প্রকাশনা

ঘেন্না-পিত্তি
সোমনাথ রায়

গ্রন্থস্বত্ব
সুচিত্রা রায়

প্রথম প্রকাশঃ কলকাতা বইমেলা, ২০১১

গুরুচন্ডা৯'র পক্ষে ঈপ্সিতা পাল ভৌমিক দ্বারা প্রকাশিত
গুরুচন্ডা৯, www.guruchandali.com

প্রচ্ছদ
অভীক কুমার মৈত্র

অক্ষরবিন্যাস
লেখক

মুদ্রণ
এস এস প্রিন্ট, ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা-৯

মূল্য
১০ টাকা (ভারত)
১৫ টাকা (বাংলাদেশ)

Ghenna-pitti by Somnath Roy a publication of
Guruchandali
First edition January 2011
Price Taka 15 Rs 10

সংকলনের কিছু লেখা গুরুচন্ডা৯, মাধুকরী, এবং সংবিত্তি, পালকি
ও সেতু-তে পূর্বে প্রকাশিত

ওঁ

আত্মার জন দিবেনা শরণ
পাপের বেতন তার
উইঢিপি নিচে একা সে মারিছে
কীট কোটি বাসনার
দেশ ইতিহাস শুনে দেবভাষ
সে বহে ক্রুশের তল
অমৃত মথনে সুধা পরজনে
তার শুধু হলাহল

ইতিমুখ

পরিচয় নেই, কখনও লেখা পড়িনি, এরকম কেউ যদি আমাকে এখন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের ইতিমুখ লিখতে বলেন– 'এখন' শব্দটা এই জন্যে ব্যবহার করছি যে, পায়ে হেমন্ত সূর্যাস্তের নাচ জড়িয়ে যখন গ্রন্থহীন একাকিত্বের জগত গড়তে চাইছি, সে-সময়ে সূর্যোদয়ের কালবৈশাখী পায়ে জড়িয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন অচেনা সোমনাথ রায়, যিনি আমেরিকায় থাকেন, এবং কবিতার মাধ্যমে তাঁর প্রতিস্বগুলোর বঙ্গীয় ডাইমেনশনটিকে ধরে রাখতে চাইছেন। আমি যখন মুম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে পাকাপাকি কলকাতা ছাড়ি, মুম্বাইতে এক-রুমের ফ্ল্যাটে থাকব বলে, তখন প্রধান সমস্যা দেখা দিয়েছিল আমাকে উপহার দেয়া কাব্যগ্রন্থগুলো নিয়ে। আসবাবপত্র ও উপন্যাস নেবার লোক শেষ-পর্যন্ত খুঁজে-পেতে যোগাড় করতে পেরেছিলুম, কিন্তু কাব্যগ্রন্থগুলো, যার প্রায় সবই অ-প্রচারিত কবিদের লেখা, সেইগুলোর গতি করার সমস্যা। নেবার লোক পাওয়া যাচ্ছিল না। কোনও গ্রন্থাগার নিতে চাইল না। আমার পাঠকরা, যাঁরা প্রায় সকলেই কবিতা-লিখিয়ে, তাঁদের আগ্রহ নেই বুঝলুম; স্বাভাবিক, সকলের কাছেই এই ধরণের গ্রন্থ প্রচুর জমে গিয়ে থাকবে। বঙ্গসমাজে যে পরিবর্তন ঘটে গেছে, তার এটি একটি কালভ্রূভঙ্গ।

প্রতিবছর, বইমেলার সময়ে বিশেষ করে, কবিতার বই কিন্তু প্রকাশিত হয়ে চলেছে। অর্থাৎ, কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়াটির সঙ্গে তার উধাও হবার সম্পর্ক নেই। ফুটপাতে রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ বিক্রি হন; যাঁরা বিশেষ চেনা নন, তাঁদের কাব্যগ্রন্থ ফুটপাতেও পৌঁছোয় না। প্রতিবছর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকার কারণ কী? কেনই বা একজন কবি তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করতে চাইবেন? আজকের দিনে, যখন জীবন অত্যন্ত দ্রুতি-আক্রান্ত, এবং কবিতার নেশাগ্রস্তরা ছাড়া জীবনানন্দের কবিতাও পড়েন না পাঠক। সোমনাথ রায়ের ক্ষেত্রে প্রশ্নটা আরও সূচিমুখ, এই জন্যে যে তিনি বিদেশে থাকেন, হয়ত আর ফিরবেন না, হয়ত তাঁর প্রজন্মের পর বাঙলা ভাষা থেকে ক্রমশ মুক্ত হয়ে যাবে তাঁর পরিবার। বাঙালির অক্ষরজীবনের যশোপ্রার্থনার কাঙ্খী নন।

তার মানে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে একটি বৃহত্তর আস্তিত্বিক প্রশ্ন ব্যক্তি-কবির প্রতিস্ববীজে জেগে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গবাসী অন্যান্য তরুণ কবিদের ক্ষেত্রে, যাঁদের কবিতার বই এই বছর প্রকাশিত

হচ্ছে, তাঁরা বাঙালি কৌমসমাজের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ঝালাই করার একটি ভাষিক হাতিয়ার রূপে নিয়ে আসছেন কবিতাকে। সোমনাথ তা করছেন না। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নামকরণ থেকে তার কিছুটা আভাস মেলে। নামটির দ্বারা তিনি তুলে ধরতে চাইছেন একটি জলবিভাজক সম্পর্ক।'ঘেন্না-পিত্তি', তাঁর কবিতার বইয়ের নাম। কাব্যিকতা থেকে মুক্ত করতে চাইছেন তাঁর অক্ষরপ্রয়াসকে, আবার সেই সঙ্গে ভাষাবিভুঁইয়ে নিজেকে ঘিরে সুর্যোদয়ের আলোটি জিইয়ে রাখতে চাইছেন। একজন কবির অস্তিত্বে কোথা থেকে কবিতার অনুপ্রবেশ ঘটে? সোমনাথের ক্ষেত্রে যেমন, ব্যক্তি-পরিসরের বিস্ময় থেকে।

কাব্যগ্রন্থের নাম শুনে, মনে হয়েছিল, আই আই টির কৃতী ছাত্র তাঁর কবিতাকে নিয়ে যেতে চাইছেন তরুণতমদের কবিতা-প্রয়াসের বাইরে। ভেতরে প্রবেশ করে, দেখলুম, তিনি কাব্যিকতা সম্পূর্ণ বর্জন করেননি, এবং এক নবতর ভাষিক দ্বন্দ্বচেতনার সৃষ্টি করতে চাইছেন। লিখিত পান্ডুলিপি আমি পাইনি। গুগল ডকুমেন্টসে পাঠানো তাঁর কবিতাগুলো এক-এক করে পড়ে আমাকে তাঁর প্রতিস্ব-পরিসরে পোঁছোতে হয়েছে। ফলে কবিতার বই পড়তে বসে স্পৃহার যে ডমিনো এফেক্ট হয়, এবং আগ্রহ কমে যেতে থাকে, তা থেকে মুক্ত হয়ে পড়তে পেরেছি তাঁর কবিতা।

সোমনাথ আমেরিকায় থাকলেও, কবিতাগুলোয় এখনও তাঁর কলকাতার ভাষিক ছবি স্মৃতি থেকে মুছতে পারেননি। ভাষিক এই জন্যে বলছি যে তিনি 'চর্যাপদ' এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে নবীকরণ করতে চেয়েছেন বস্তুত, 'ঘেন্না-পিত্তি' শব্দবন্ধটিও কলকাত্তাই। 'ঘেন্না' অংশে তিনি ছন্দবর্জন করেননি, যা করেছেন পিত্তি অংশে। সে-কারণে 'পিত্তি' শব্দটি হয়ত পাঠককে শার্ল বদল্যার-এর 'স্পিলন' কবিতাটির কথা মনে পড়াবে। বদল্যার-এর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই সোমনাথ-এর ভাষিক প্রতিস্বে। সোমনাথের অন্তরভাষটি ভিন্ন; সংবেদনের ইমপ্লোজান বললে সম্ভবত বোঝানো যায় ওই অবস্হানটি।

আমি প্রতিটি কবিতা ধরে-ধরে পাঠবস্তু বিনির্মাণ করতে চাই না, সে-সব কাজ ব্যক্তি-পাঠকের। আমি কেবল কবির হাত থেকে পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছি।

মলয় রায় চৌধুরী
মুম্বাই

ঘেন্না-পিত্তি

বড়দিনের কবিতা	৯
১১/১১	১০
বসুন্ধরা	১১
কালো বেড়াল	১২
তৃতীয় পুরুষ	১৩
স্পাইডারম্যান	১৪
গুলাল	১৫
অনুপম কথা	১৬
তন্ত্রসার-	১৭
প্রেম	১৮
তমালিকা	২০
প্রতিকবিতা-১	২১
প্রতিকবিতা-২	২১
ম্যানহাটন	২২
মিসিসিপি	২৩
কোল্ড ওয়ারের কবিতা	২৪
উত্তর	২৫
যাঃ ও-পাখি	২৬
মহাবিশ্বে, মহাকাশে	২৭
দেশ	২৮
মরচে	২৯
নিঃসঙ্গতা- ১০০	৩০
এ শরীরে অন্য কোথাও	৩১
কৃষ্ণা কটেজ	৩২
পুজো, অ্যামেরিকা ২০০৪	৩৩
কলকাতা- আরণ্যক	৩৪
কলকাতা- প্রাগৈতিহাসিক	৩৫
রাত্রি	৩৬
স্ট্রিপ ক্লাবের কবিতা	৩৭
ভাগ্যিস	৩৮
চা	৩৯

যেন্না–

বড়দিনের কবিতা

ও ঘৃণা, অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হও,
দগ্ধ করো তাকে, পুড়িয়ে ছাই করো
ভস্মে থাকা উচিৎ যেসব, ফিরে যাক ভস্মরূপে ফের।
ঐ চোখ, চাহনি ও ভ্রূ-ভঙ্গিমা,
ওষ্ঠে আয়ত হাসি, গালের দুপাশ বেয়ে নরম চুলের মতো
ঘাসের আশ্চর্য সবুজ বিন্যাস–
ভস্ম করো সব

ও ঘৃণা, অ্যাসিডে ভাস্বর হও।
স্মৃতির গোপন থেকে রাতের গরিমা সাফ করো।
ঐ ত্বক, অত উজ্জ্বল আর যা যা কিছু
বুকের মায়াবী প্রেম
আঙুলের ছায়া-সম্মোহন
আর যা যা ছিল পাহাড়ের মুগ্ধতা নিয়ে,
বিক্রিয়ায় রাখো তাকে– বিকৃত করে দাও
মায়ার সমূহ সমাহার

ও ঘৃণা, অনীহায় উজ্জ্বল হও।
ব্যর্থ করো, নষ্ট করো সেই সব
আদরের রাত।
নিপুণ ধর্ষকামে ধ্বংস করো সমস্ত পেলবতা তার

আমাকে পবিত্র করে দাও।

১১/১১

এই একাকিত্ব ঘৃণা করি
ঘৃণা করি রাতের গভীর
ঘৃণা করি বাঁকা নদীতীর
ভুল করে ছোঁয়া টেলিফোন

ঘৃণা করি সিনেমা সফরি
বালিশের ওমে খোঁজা সুখ
ঘৃণা করি আজ তোর মুখ
ভুল করে বাঁচার জীবন

বসুন্ধরা

বৃষ্টি নামেনি
কেবল আষাঢ় এসে সরে গ্যাছে বাঁধানো ক্যালেন্ডারে
এতদিন যা যা এসেছি ফেলে, বিগত বছর ধ'রে
ডাস্টবিনে, গুল্মের ঝোপে
এখন রোদের নিচে, ধুলোর বিষাদ মেখে
সেই শব থেকে ধোঁয়া ওঠে
দৃষ্টির বিভ্রমে এঁকে ফেলি বিষধর ফণা, মাটির ফাটল জুড়ে
মাটিও তো আকাশে তাকিয়ে–
অক্ষয় ক্লান্তিতে নির্মেঘ সমস্ত দিন
পুড়তে পুড়তে তবু ভাবি
বিকেলেই বৃষ্টি নামবে

কালো বেড়াল

ও কালো বেড়াল,
তোমার জন্যেই সব্বাই বেঁচে আছি
শুধু, শুধু তোমারই জন্যে
হিসেবের খাপে বেশ দিনগুলো আছে
কখন যে তুমি এসে আঁচড় বসিয়ে যাবে
উরুতে চামড়া ছিঁড়ে মাংসের রক্ত দ্যাখাবে
এমন-ই জীবন;
আর সেই জ্বলুনির মুখে
কান্নারও অজুহাত লাগেনা।

ও কালোবিড়াল, শুধু এই ভেবে
এই সময়ের পথে হাঁটা
সব্বারই
কোণার দরোজা থেকে ওই তুমি উঁকি মারো
টিভি সিরিয়ালে ঘেরা এইসব জীবনের মাঝে
কখনও বাস্-এর চাপা দেওয়া
কখনও হসপিটাল- ফিনাইল-গন্ধের সাঁঝ,
ও কালো বেড়াল,
সবাই তোমাকে দ্যাখার জন্যে, ওখানেই বসেছি সবাই
মরে যাওয়াটার ঠিক আগে

তৃতীয় পুরুষ

বন্ধুর দিকে দুটো হাত বাড়িয়ে ধরেছি
বাকি সব কথা ভুলে যাচ্ছে মন
দ্যাখো, এখনো অন্যরা সুযোগ মত হাতের পাতায়
ঘটনা পরম্পরা লিখে যায়
আর, এই তটে
পাড়-ভাঙা স্তব্ধতা–

মাটির কাছে, ঘাসের ভিতর সমস্ত বিছিয়ে দিয়েছি
যদিও আমার কাছে কোনো গল্পই ছিলনা,
চুম্বকগুলো সব হিমবাহ হয়ে থেমে গ্যালো।
ওদিকে দ্যাখো,
নষ্ট সময় সন্ধ্যে এলে আরও একলা হয়ে পড়ে
অথচ এই সব ছেড়ে দেবো ব'লেই তো
হাত তুলি বন্ধুর দিকে,
বিকেলের ক্যান্টিনে–

না হয় আমার কোনও গল্প নেই কোনও গানও নেই
তবু, কবিতার শেষে কেন একটু নাচেরও অবকাশ থাকবে না!
আবারও সেই ভরসায়
বন্ধুর দিকে দুটো হাত বাড়াই আর,
সবকিছু নষ্ট হয়ে আসে
মাথার ভেতর চাষের জমি খরায় ফেটে ওঠে
লাঙল সত্যিই বেড়িয়ে যায় মুঠোর থেকে
আর, সমস্ত দিন হার-স্বীকারের পর,
তখন সময়েরও ঘেন্না করে।

স্পাইডারম্যান

ক্লান্ত দিনের শেষে দেখি
ফিকে মানুষের দলে আবছায়া তমালিকা বাড়ি ফেরে
একই পথ ধ'রে আজ, শুভঙ্কর ফিরবে এবার, একই ঘরে
আমিও আহূত আজ,
ওদের বাড়িতে আজ বিশাল টার্কি কাটা হবে

শুভঙ্কর আমাকে করুণায় রাখে।
আর, মুখোশের আড়াল থেকে রুক্ষ ঠোঁটে
তোকে খুঁজছি আমি,
তমালিকা–
তাই, এই গল্পের শেষে বনবাস অনিবার্য হয়
অনিবার্য পরিচয় মুছে দিতে হয়

এ এক আশ্চর্য ত্রিভুজ, যার একটি শীর্ষ থেকে আমি
হাইরাইজের পথে ঝুল ধ'রে দোল খেতে থাকি।

(ঋণস্বীকারঃ স্যাম রাইমি)

গুলাল

বিষের অঘোরে থাকে ফুলশয্যা, অগ্নির রাত
যেমন জ্বলেছে কোনও গৃহস্থালী, ধানের সঞ্চয়
নিবিড় নীলাভ রাতে উল্কা ঝরলে দেখো, ভয়ে–
বাঁশঝাড়ে, তালশাখে ডানা ম্যালে আবার আগুন
আকাশে ভীষণ ছিল মৃতস্বপ্ন, কুয়াশা-শিহর
নিংড়ে দিচ্ছে ঐ চোখেমুখে দহনের খনি
সব হারিয়েছে যা যা কাছে ছিলো, যা যা ছিলো দূরে–
সিঁড়ির নিগড়ে শুয়ে অসহ্য সীসা-যন্ত্রণা
এখানে আবির খেলা, এই তো দোলের পূর্ণিমা
বৃন্দাবনের পথে: খুনী-প্রেম, ভ্রাতৃহত্যা– সব-ই
পরিচয় পেয়ে গ্যাছে, বুলেট আর বিষমাখা ছুরি
তখনও ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি

(ঋণস্বীকারঃ অনুরাগ কাশ্যপ)

অনুপম কথা

লোকটা হারিয়ে গিয়েছিলো
দুপুর-ঘুমে পড়তে থাকা বইটার খোলা পাতায়
বিকেল নামলেই যেখানে রোদ্দুর আঁকড়ে নেয় গাছের মগডাল
অসম্ভব মায়াবী সোনারঙ
নিজেকে খুব প্রত্যাখ্যাত মনে হয়েছিল
পরিত্যক্ত, জাহাজের ভাঙা মাস্তুলে সেই রোদ লেগে গিয়েছিলো
ডানদিকে টিভির ঘরে তখন পূজাবার্ষিকী সিনেমা,
তখন-ই, বারান্দার চেয়ারটা গ্রেহাউন্ড হয়ে উঠে জুতো মুখে
ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা বাড়ি–
ভয় পেয়ে চলে যেতে হলো কলের তলার জলপ্রপাতে,
বা, বইটার মাঝখানে, পাতায়, অক্ষরে, ...শূন্যস্থানে

ঐ বইটা আর কেউ খোলেনি
দোকানে দোকানে ঐ নামে অনেক বই বিক্রি হয়
একই মলাট সবাকার, তারা এর যমজ বা সহোদর– হতে পারে,
কিন্তু এখনও খাটের ওপর বইটা পড়ে ওভাবেই আছে
আর ওই ভদ্রলোককেও আর খুঁজে পাওয়া যায়নি
সমস্ত ঘেন্না জড়ো করতে করতে সে হারিয়েই গ্যালো।

এখন যদি কেউ এই ঘরটায় ঢোকে
প্রথমেই তার দুচোখ জ্বালা দিয়ে জ্বর আসবে
অসম্ভব ঘুম পাবে, আর সে দেখবে
ফ্যানের হাওয়ায় বইটার আলুথালু পাতা
খাটে পড়ে রয়েছে দাঁত দিয়ে কাটা নখের টুকরো
চামড়া ঘষে তোলা মাটি, আর বাতাসের একদম ওপরের ডালে
লোকটার নিঃশ্বাসের শন্‌শন্‌ শব্দ।

(ঋণস্বীকারঃ জয় গোস্বামী)

তন্ত্রসার–

রৌপ্যজল স্বর্ণরেণু পদ্মবীজ নিয়া।
শূন্যে আসীন কন্যা ত্রিভুজ উপজিয়া॥
ভোজনে স্বয়ং অগ্নি হাসে উপস্থিত।
শুক্রতেজ ব্রহ্মে ক্ষয় বিষাদে শোণিত॥
করতালে জন্মছিন্ন উপবীত লোপ।
বর্গভিতে তিন ডুবে তিনেরই প্রকোপ॥
বলি যাচে অক্ষিপীঠে দেবদেহমূল।
সিদ্ধিকোণে স্বর্গ স্বাহা মৃত্যু সমতুল॥

প্রেম (কাহ্নপার পদ থেকে)

প্রেমের আশ্চর্য বাড়ি সব হিসেবের থেকে দূরে
জাতিভেদে বিত্তভেদে সবাই কখনও আসে ঘুরে
এইবারে, দ্যাখ প্রেম আমিও দেখতে যাব তোকে
ঘৃণাজয়ী যোগী আমি, লজ্জা ছেড়েছি নির্মোকে–
সৃষ্টির রহস্যমূলে রতিকলা কামনার ঘোর
সেইখানে লীলাময়ী প্রেম তোর নাচের আসর
আমিও মোহিত হই, বিনম্রে রাখি জিজ্ঞাসা
অজানার কোন পথে আশ্চর্য এই যাওয়া-আসা?
যে সুতোয় বেঁধে দিস অদৃশ্য আলোর উজানে
রঙের নেশায় মজে ভুলে গেছি বাকি সব মানে
সেই পথে পথ হেঁটে পথ ভুলে আমি কাপালিক
কামনাও হারিয়েছে এই শব, হাড়ের অধিক-
শুকায় করুণাধারা, খায় প্রেম জীবনের সার
সেই প্রেম খাব আমি সৃষ্টিচক্র করে ছারখার।

মূল পদঃ কাহ্নুপাদানাম্
চর্যাপদ-১০ (রাগ দেশাখ)

নগরবাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো বাহ্মনাড়িয়া॥
আলো ডোম্বি তোএ সম করিব মা সাঙ্গ।
নিঘিন কাহ্ন কাপালি জোই লাংগ॥
এক সো পদুমা চৌষঠ্ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী॥
হা লো ডোম্বি তো পুছমি সদভাবে।
আইসসি জাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ॥

তান্তি বিকণঅ ডোম্বি অবরনা চাংগেড়া।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়পেড়া॥
তু লো ডোম্বী হাঁউ কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘেণিলি হাড়ের মালী॥
সরবর ভাঙ্গিঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ।
মারমি ডোম্বি লেমি পরাণ॥

তমালিকা

তমালিকা, ওইখানে যেয়োনাকো আর
তমালিকা ওইখানে একানড়ে আছে
ওইখানে যন্ত্রের ঘরে তাদের সমস্ত খিদে
কালপেঁচা হয়ে ডানা ম্যালে
তার তীক্ষ্ণনখরে তোমার পশম গাল.....

তমালিকা, ওইখানে তোমার সমস্ত প্রত্যাখ্যান
প্রতিশোধে ভূত হয়ে আছে
দশবছরের ব্যর্থতা ওইখানে ঘেন্না-পোষাকে
তোমার পশম গাল হলুদ অ্যাসিডে চিরে দেবে,
ওইখানে আমরা তোমাকে.....

ওইখানে যেয়োনা কখনো
তমালিকা, ফিরে যাও শতাব্দী-প্রাচীন কবরে

প্রতিকবিতা-১

এভাবে বললে ওরা রেগে যাবে তাও ভয়ে ভয়ে বলি
উন্মাদ পশুজিহ্বা- নারীর শরীরে রসকলি
ফ্রক উঠে গেলে দেখো চামড়ায় চকচকে আলো
মাঝঘুমে স্বপ্ন এলো, মাঝস্বপ্নে শয়ন মারালো
যে হাতে ক্লান্তি খ্যালে সেই হাতই লেখালো খাতায়
শুধু তোর কথা ভেবে গোটা দিন গাঁড়ে দেওয়া যায়

প্রতিকবিতা-২

তৃতীয় পাদের শেষে যেই তোর নাম লিখি, থামি-
নির্জন বালুচরে আমাকে তপ্ত ফেলে রেখে
তুই চলে গিয়েছিলি সবুজ বনস্থালী দেখে
তুই চলে গিয়েছিস পদচিহ্ন ধ'রে এঁকেবেঁকে
আজ, যে পাদে বিষের বায়ু তোকে ভেবে তাকে ছাড়ি আমি-

ম্যানহাটন

গ্রাম ছেড়ে শহরে এলাম
এখনও হাঁটছি ঠিক ঠিক
ব্লকগুণে, পথচিহ্ন দেখে–
অযাচিত মানুষের ভিড়
–অথবা একেই দেখব, তাই,
গ্রাম ছেড়ে শহরে এলাম।

অযাচিত ইতিহাস সরে যায়
মিছিলের মত তাকে ভুলে যায় লোকে–
বিস্মৃত, বিস্রস্ত, তাই
আলোলাগা হর্ম্যকিরীট
ঘেন্নার পতাকা ওড়ায়
সাররাত, গোটা শীতকাল-

মিসিসিপি

সজীব স্পর্ধা থেকে ক্রমশঃ প্রকাশে অহমিকা
শিকারীর মত তার বন্দুকের নলমুখ থেকে
ছেঁকে ন্যায় জলের অন্তিম বিন্দু, মাটি;
কাঠির ডগায় ক'রে লেপে দেয় গর্জন তেল,
এলবোয় ভর দিয়ে বারুদ আর সীসের ম্যাজিকে
ফিকে হওয়া মৃত চোখমুখে
ঝুঁকে পড়ে দেখেছে তখনও সজীব রয়েছে ত্রাস, অবিশ্বাস–
শ্বাস বেরোনোর আগে অনন্তস্পর্শী কিছু কষ্টও
স্পষ্টতঃ তখনও প্রকাশে–

ঘাসের উপর থেকে সেই সব পাপের প্রদাহ
আহরণ করে, সে, শিকারী, ফের
বেরোয় আগুন হাতে, পরবর্তী প্রাণীটিকে দেখে
সেখানে ছড়িয়ে দ্যায়, অনুরূপ যন্ত্রনা, অনুরূপ অবিশ্বাস থেকে–

একে কেউ হত্যা বলিনি, চেনা ভাষ্যে এই সভ্যতা:
কথা-অপলাপে শুধু নদী ব'লে কেউ ভুল করে।

এসব কষ্টের কথা
সহস্র ক্রীতদাস, যারা সেই যজ্ঞে উৎসর্গ হলো
তারপর আগুনে ঢালা হয়– ঘি,
মধুর কয়েক ফোঁটা;
সেই ঘ্রাণে পিপীলিকা এলো
তার সঙ্গে মধুকরও কিছু;
তখন প্রকৃত শীতকাল–

উত্তর

এখানে উত্তর; মানে একটা আদ্ধেক শীতকাল, আদ্ধেক কারণ সেখানে পেঁয়াজকলি নেই, মটরশুঁটি খেতের পিকনিক নেই, ক্যাম্বিসবলের ক্রিকেট নেই, জয়নগর নেই– কেবলই উত্তর, ভিজে ঠাণ্ডা হাওয়ার সাথে হলদে হলদে নিমপাতার বয়ে আসা, দুপুরের শেষভাগ থেকে ঘ্যানঘ্যানে মশা আর সন্ধ্যের মুখে কুয়াশা অন্ধকারে ভেসে আসে ধোঁয়ার গন্ধ, বাতাস ভারী করে নিঃশ্বাস চেপে ধরে পরীক্ষার আগের দিনের ছোটবেলা! টানা যায়না, এসব টানা যায়না, এখানে উত্তরকে ঢুকতে দিতে নেই, ঢুকতে দিতে নাই সেইসব রঙচঙে পাখির বাহারও, যাহাদের ঠোঁটের ডগা তৈরি হইয়াছে গাছের কোটর হইতে পোকার লার্ভা বাহির করিয়া আনিবার তরে। এমনকী একটা পালকও যেন না ঢোকে। ঝুলঝাড়ুগুলোকেও কাগজ দিয়ে মুড়ে রাখছি আমি, আমার অভিসম্পাতে মাকড়সা অবধি ডিম পারেনা এখন। শেষ যে দিনটা মনে পড়ে মাকড়সার ডিমের তলাটাকে দেশলাই দিয়ে ফুটো করেছিলাম আর ঝুরোঝুরো ভ্রূণকে চটি দিয়ে পিষে পিষে। আর ঠিক ঐটা করার পর মনে হয়েছিল আমাদের অজাত সন্তানের হয়ে একটা শেষ প্রতিশোধ হয়ে গ্যাছে, তাই সব নিঃশ্বাস চেপে ধ'রে কুলকুন্ডলিনী জাগাতে বসেছি আমি। খুঁজে নিয়েছি দুপায়ের সংযোগ থেকে রেতঃর অদ্ভুত থেমে থাকা, বাম নাসারন্ধ্রের প্রশ্বাসকে দক্ষিণ নাসায় নিঃশ্বাসরূপে বাহির করিতে করিতে শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে আসা এনার্জির শিরশিরানি। নিজের শরীরে অক্সিজেন কমাতে শিখেছি আমি, শিখেছি গাঁজার ধুনকি ছাড়াও জয় রাধার নামে পাগল হয়ে সংজ্ঞা হারানোর আগের মুহূর্তে ব্রেনের আশ্চর্য মগ্নতা। এই শীতকাল চাইনা আমি তাই, আমি জেগে থাকতে চাই রাতের আরও কিছুটা বেশি অন্ধকার অবধি যখন মৃত মাকড়সার ভ্রূণভূতগুলো জেগে উঠবে, ঘর ভরিয়ে দেবে পালক ছাড়ানো মরাপাখির গন্ধ, ছোটবেলার প্রাচীনতম স্মৃতি থেকে মুছে দেবে নলেনগুড়ের অবিনশ্বর ঘ্রাণ।

যাঃ ও-পাখি

ও পাখি তোর ব্লেড বসানো নোখ
ঠোঁট বাঁকা ঠিক সূচের গরম ফলা
আঁচড়ে শামুক দুরন্ত নির্মোক
ছিবড়োনো হাড়-চামড়ায় সুখ তোলা

ও পাখি তোর থাবায় আঁকড়ে নিয়ে
ডানার ঝাপট চাবুক যেমন পিঠে
মারতে বসিস উল্টে ও পাল্টিয়ে
হাড় বেঁকিয়ে ছাপ ফেলে কালসিটে

ও পাখি তোর নজর এমন গাঢ়
কাবাব যেমন বিদ্ধ করিস শিকে
শ্বাস থাকতেই পিঠ ভেঙে দিস তারও
ঝুলিয়ে রাখিস ‘‘বিক্রি আছে’’ লিখে

থাবায় ঠোঁটে মাংস নরম ছিঁড়ে
উড়বি বলেই ধরলি গাছের ডাল
ওহ্ পাখি তোর দুকান জোড়া হিরে
কষ বেয়ে রস সস্-এর মতন লাল

মহাবিশ্বে, মহাকাশে

তোমরা কখনও এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ঢুকেছো?
দরজার শেষে এসে সব কিছু বড়ো হয়ে যায়,
সব সাদা- হালকা সবুজ
ফুলেরা সাঁতার কাটে জ্যোৎস্নার ঝর্ণাধারায়
আমার দুপাশে পড়ে আয়না,
আর, চারপাশ থেকে আলো হাঁ ক'রে গিলতে ছুটে আসে

তোমরা কখনও ঘুম থেকে হঠাৎ জেগেছো?
দারুণ বেতের মতো আলোর চাবুক খেয়ে চোখে
ঠিক গল্পের মতো—
সবটাই সত্যি, সবটাই
স্বপ্নেই পড়ে ফ্যালা যায়
আর, চারদিক থেকে বন্ধুরা ছুরি হাতে মারতে এসেছে

ব্রুটাস তুমিও ছিলে পরীদের দলে
তোমাকে প্রেয়সী ভেবে সাজিয়েছি এতটা সকাল!
তোমরা কখনও ছুরি-কাঁচি কিনতে গয়নার দোকানে ঢুকেছো?
নারীরক্ত জমে যায়, লাল হয় সিঁদুরের ফোঁটা
বন্ধু নামের থেকে পশুগন্ধ উঠে আসে, ওক্-
আমি নাক চাপা দিয়ে সত্যি থেকে স্বপ্নে পালাই।

দেশ

জড়িয়ে রয়েছে এক অদ্ভুত মায়া এই ছায়াঘেরা শান্তির তটে তার শ্যামলিমা পুরানো বটের কাছে নতশিরে সম্মতি মাগে ঠিক বৃষ্টির মতো ক'রে নিদাঘ শীতল ক'রে দ্যায়।
এমন অপার প্রেম স্বপ্নের গাঢ়মূলে তার বীজন বুলিয়ে চলে মুক্তির ঘনতর স্বাদে মুছে দ্যায় সত্তর সব করণীয় ঢেকে ফ্যালে।
এটাই আমার দেশ– আর, এই খন্ডিত পলে, তমালিকা প্লিজ আমাকে ক্লান্ত কোরোনা।

-পিত্তি

মরচে

সেখানে গান থেমে যায়, মানে এতই পৌনঃপুনিক সব শব্দ আর সুর যে চালিয়ে রাখার আর কোনও মানে হয়না তাই ঘরের ভেতর জুড়ে শূন্যতা- পানুও ও পৌনঃপুনিক বড়ো, সেই একইরকম- প্রবেশ-নির্গমনের একঘেয়ে মেকানিকাল সাইকেল। অনেকদিন সাইকেল চালাইনি ভাবতে ভাবতে চেনটার কথা মনে পড়ে। পৌনঃপুনিকতার লিংক কেটে দিলেই চেন একটা মারণাস্ত্র। ছররার মতো দাগ এঁকে দ্যায় চামড়ায়, বেদনা, বেদনা বড়ো; বেদনা কারণ এই মুহূর্তে আমার ঠিক তোর কথাই মনে হচ্ছে- যেভাবে অদ্ভুত সব দাহ আর ক্ষতের গল্প বুনে ইমোশন নিয়ে রাগেভাগে খেলা হতো: যেভাবে বলতাম গ্যাসের আগুনে আঙুল স্থির রেখেছিলাম কিম্বা দু-আঙুলের ফাঁকে ব্লেড নিয়ে গেঁথে দিয়েছি মাংসের ইঞ্চি-গভীরে, এবারও কি সম্মতি দিবিনা, বলে ফ্যাল। এসব থেকে আজ অনেকখানি দূরে আমরা দুজনই, তবু বলে যাই বেদনারও একটা সম্মোহন আছে ডায়েরিয়ার মতন বগ বগ ক'রে যখন রক্ত বেরোতে থাকে, তার মরচে স্বাদ কিম্বা পুড়ে যাওয়া ত্বকতন্তু থেকে কার্বনের বন্ধনী ভেঙে প্লাস্টিক কারখানার গন্ধ বেরোয়- এই ফুরিয়ে যাওয়ার এতখানি বিস্মৃতি থেকেও আজ সেই নেশা ডাকছে আবার।

নিঃসঙ্গতা- ১০০

এই নিকষ বৈধব্যে আমি
পালন করছি অদ্ভুত সব স্ত্রী-আচার যা আগে কেউ কখনও মেনে দ্যাখেনি
কারণ, এর মধ্যে উপ্ত আছে এক অনাঘ্রাত প্রায়শ্চিত্ত
কারণ আগে কেউই তার দয়িতকে নিজের হাতে এভাবে মারেনি
যেভাবে আমি
তার রক্তের শেষতম ধারাটির সঙ্গে মুছিয়ে দিয়েছি
ঈশ্বরের তৈয়ারি আকাশ আলো জগৎ
ঝর্ণার শব্দ, পাখিদের কলতান আর মানুষের চিৎকার;
রৌদ্রের হলুদ মায়ারঙ পুড়ে গিয়েছে বরফের প্রতিবিম্বে
যেরকম আমার মানুষ, কবরের ভিতর
তার চোখ চামড়ায় ঘেন্না জাগানো পোকাদের ডাইনিং হল ছেড়ে
ডাইনির পরম মমতায় আমিই সৃজন করেছি
অনাঘ্রাত নতুন পৃথিবী
যার অদ্ভুত সব ক্রিয়ারঙ আগে কেউ কখনও মেলে দেখেনি
প্রেমের পৃথিবী ঠিক সেভাবেই ভুলে গেছি
যেরকম খেয়ালে রাখিনি
আমার রোমরাজি কখন বাদামি হয়েছে, কখন সাদা হচ্ছে-

শুধু, এইখানে, গন্ধহীন আকাশের বুকে
আমার সৃজন করা মিস্ত্রিরা দীর্ঘতর করে সেমিনার
টাওয়ারের ধাপ বেয়ে উঠে যায় আমার-ই সন্তান
গতির সূত্র মেনে ক্রমাগত উঠতেই থাকে;
ক্রমশঃ এবং ক্রমাগত-

(ঋণস্বীকারঃ গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ)

এ শরীরে অন্য কোথাও

এ শরীরে অন্য কোথাও
কবিতা রয়েছে কিনা জানিনা-
তবুও মুগ্ধতা নিজের ভেতর থেকে
গুঁড়ি মেরে ওঠে।
ওগো তরুলতা, ডাল মেলো, পত্র মেলো।
অন্য কাউকে বলবোনা,
সামাজিকীকরণের প্রশ্নই রাখিনি কখনো,
শুধু এর-ই মধ্যে
অন্তর্দহনের চিতা সাজিয়েছি।

# # #
এই গল্প আমি তোমাকে দিতে পারবোনা
অথচ, এটা কি ঠিক হবে, মন?

# # #
মনের দোহাই দিয়ে আর সব সরিয়ে রেখেছি
এ শরীরে অন্য কোথাও কবিতা থাকলেই বা কী?
স্বপ্নের আগে আমি
তোমাকেই ঘুমিয়েছি–
ফ্যাশন টিভি-র মেয়ে

কৃষ্ণা কটেজ

তোমাকে পড়াবো বলে এখনও কবিতা লিখি আমি
তোমাকের দেবোই বলে রাত জেগে গাঢ় পাগলামি
নিয়ে যায় বিফল বারতা:

রাস্তা অন্ধকারে লেখা থাকে পথের ঠিকানা
কিম্বা পথের ঢিলে হেডলাইটের আলো কানা
কাদাগলি হাঁটার জড়তা-

এখন নেশার মাঝে পুরোনো লাইট জ্বলে ওঠে
খাট ভেঙে অক্ষর দুলে ওঠে নীলকালি ঠোঁটে
গলা ধরে তিতোর প্রমাদ,

এখানে পাহাড় পথ ভেঙে ভেঙে অ্যাভালাঞ্চ পড়ে
মরে যাওয়া প্রেমিকার প্রতিশোধ গোনার নখরে
স্বপ্ন কেমন-করে চাঁদ-

তোমাকে শুঁকবো বলে এখনও আকাশে মুখ রাখি
দুপুরের কড়া রোদে শহরের ফুটপাথ মাখি
বুকে মাখি ডিও-র ভণিতা.

ঘামের বিষাদ থেকে ফোঁটা ফোঁটা হেম ঝরে পড়ে
কলেজের লবি ছেড়ে বাস ধরি একলা হা'ঘরে
ফাটা ঠোঁটে ওড়াই কবিতা।

(ঋণস্বীকারঃ একতা কাপুর)

পুজো, অ্যামেরিকা ২০০৪

যে কষ্ট স্বপ্ন দ্যায়,
তাকে তুমি যে নামেই ডাকো
বাবা বাছা করো বা সোহাগ মাখিয়ে দাও মুখে
কোনও কথা শুনবেনা,
মানবে না ভিড়ের নিয়ম
দারুণ রোদের নিচে শরীর খুবলে খেয়ে যাবে।

রাত জাগাবেই, তবু দিনের প্রবল সমারোহে
সামান্য সুযোগও সে ছেড়ে দেবে?
কী ভেবেছো তাকে?
উৎসব থেকে দূরে একলা কিউবিকলে তুমি
যতই লুকোও আর যতই আড়াল খোঁজো,
বলো,
কোনওদিনও, কখনও কি-
- সে তোমাকে একা হতে দেবে?

কলকাতা- আরণ্যক

আমার চলার পথ এটা নয়
এই মাঠপথ, ক্ষেতপথ, ধানপথ কোনোটাই নয়
এমন কী পাহাড়ের গা-বেয়ে চড়াই উৎরাই গানগুলো,
দুপাশে জঙ্গলে তোর ওড়নায় মিশে যাওয়া-
ঝাঁঝালো ফুলের গান, কোনও দিশা দ্যাখালো না দ্যাখ

জলের ছোঁয়ায় এসে পাথর ও নিশানা হারায়
অলক্ষ্য থেকে দেখি
তোর চোখে সূর্যের লাল, আমার নতুন লেখা
লাল দিন আনবে তো ঠিক? পথের বাঁকেতে এসে
ছুঁড়ে দেওয়া কবিতার ভাগ
বস্তুনিষ্ঠ কোনো সমাধান এইটাও নয়।

নরম রাস্তা ধ'রে জলের জন্য হেঁটে যাওয়া
ওপরে মেঘের খেলা
এগোনোর সীমানা দেখায়
আমি সব ফেলে আসি-
গান কবিতা ও মৌনতা
পাথরের ঢালে শুয়ে আড়চোখে
তোর চোখ দ্যাখা,
নদীর, নুড়ির বুকে
আকাশের মতো মিশে যাওয়া,

বাঁধের সামনে এসে সব নদী স্থির হয়, আর,
আমাদের মাঝখানে কলকাতা শেষতম বাধা

কলকাতা- প্রাগৈতিহাসিক

যদি সব বিজ্ঞান মুছে ফেলি আজ
যদি গুহাগর্ভে আজ বসি শূল্যমাংস মহাভোজে
তমালিকা থাকবেই, সেইখানে, প্রস্তরের গায়ে
বাইসন এঁকে যাবে তাহার রঙিন পেনসিল
বিষাক্ত মদিরা লয়ে, মৃৎপাত্রে, সম্মুখে দাঁড়ায়েছি, আর-
-আমাদের মাঝখানে কলকাতা শেষতম বাধা

রাত্রি

এক রাত্রি তোমাকে ছুঁয়েছে- তার স্বপ্নে
গহীন কোনও অরণ্য ছিলো, যেখানে শুধুই চাঁদের আলো
পরী নামবে ভেবে পাইনশাখার ফাঁকে ঝিকিমিকি খেলা
রেখে দ্যায়।
এক রাত্রি এতদিন অপেক্ষা শিখেছে, তার স্বপ্নের রাতে
ঘাসের শিকড়ে মুখ গোঁজে আগুনের ফুলকি
কারণ ঘাসের মানে, তোমারও অজানা নেই আর

সেইখানে উৎসব নামে, নদীর বুকে অদ্ভুত মায়া
ফুরিয়ে আসলো ক্রমশঃ,
ক্রমশঃই খুব চেনা শহরের মতো
সেই অরণ্য যা যা কথা বলে
সে সব-ই তো জানা কথা, বৃষ্টিরও অজানা নেই আর
তাই, এইবার প্রশমিত হবে- সকালের লালচে আকাশ
রাত্রি খোঁজেনা আর,
পাহাড় ও খোঁজেনা- শুধু সেই শূন্যস্থান জুড়ে
এই-রাত্রি বসে আছি আমি, সব নিয়ে, স্বপ্নে, নিভৃতে-
যা কিছু তোমার ফেলে যাওয়া।

স্ট্রিপ ক্লাবের কবিতা

এমন নৃত্যভঙ্গে তোমার বিহনে যা যা আসে
সে সব মোচন করা ভালো
তরঙ্গ জুড়ে তবু অসার এই মন আর তনু
তখন রাতের মাঝে আশ্লেষহীন সেই আলো
জাগালোনা কিচ্ছুই, শুধু বিচ্যুত হই, এই আমি
কখনও সে পোলে চড়ি, কখনো আমাকে খেলে হামি.....

সে কি আর লিখবোনা এখনও শিখিনি ঐ খেলা
জানি কোনখানে তুই,
জানি কোনও অন্য আলো খোলা
তারও দূরে ছুঁয়ে গ্যাছে, অজ্ঞাত আকাশের মতো
সে প্রাচীন অজ্ঞতা, এখন যা পুঁজ জমা ক্ষত
কমবেনা, ক্যান্সার, বেড়ে যাবে শহরের ধোঁয়া

খোসার মতই তবু খুললেই বৃষ্টি বিকেল
লবঙ্গ রাখা ছিলো সেই ঘ্রাণে, ঘামের বিশেষ
অশেষ, আমিও দ্যাখো ডাক দিই কবিতাও ঝরে
বৃষ্টির নাম লেখে ঝরে পড়া অন্তর্বাসে–
আছে কি এখন কেউ, সেই বুদ্বুদ, সেই মায়া
যেদিকেই তাকিয়েছি, রোদে রোদে শুধু তোরই ছায়া

ভাগ্যিস

এক কলকাতা দূরত্ব
ভিজে গ্যাছে ভাগ্যিস বৃষ্টিতে
ভাগ্যিস শিখে গেছি ভেজা চশমার কাঁচ
রুমালে শুকিয়ে নিতে হয়,
যখন তোমার সামনে বসে
ভাগ্যিস জেনেছি তখন কান্নার অবকাশ কম
কেবল নদীর ঢেউয়ে
ছই নৌকোর ছবি লেন্সে লাগিয়ে নিতে নিতে
ভাগ্যিস জেনেছি এখন
ভুল করে ছুঁয়ে দেওয়া ভুল
বৃষ্টির কলকাতা ভুল
অনেক অটোর পথ পেরিয়ে সেখানে
অনেক ফুটপাথ জল পেরিয়ে সেখানে
ভাগ্যিস কোনও কারশেড
ভাগ্যিস শিখে গেছি তেষ্টার ভারী আবডালে
চুমু খেতে হয় সিগারেটে
ক্যাজুয়ালি–
তারপর বৃষ্টি থেমে গেলে
কিম্বা বৃষ্টি মাথায় মেখেই
আরও আরও সব কলকাতা জেগে ওঠে
সেসব পেরিয়ে যেতে যেতে
এ-শহর বড়ো হয়ে যায়,
ভাগ্যিস!

চা

চা যখন খেয়েইছি, থ্যাংক ইউ বলাই দস্তুর
এভাবেই পরম্পরা মেনে নিয়ে ক্রিয়া ও বস্তুর
ভাঁড় ভেঙে হেঁটে গেছি, ঝাঁঝরির ফাঁকে পোড়া মাটি
স্নিকারে জলের দাগ, অথবা সে বৃষ্টির ছাঁট-ই
মেঘে-ঢাকা শীত, এলো, ছাতা-খোলা, তাকানোও মানা?
অথচ গলির মোড়ে-কালভার্টে হলো চেনা-জানা;
ক্রমশঃ কথাও হলো, রাখা হলো কোনও প্রতিবাদ,
সেই কবে চা খেয়েছি,
জিভে আজও গাঢ় বিস্বাদ।